ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1226-1243
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.343

একুশ শতকের জন্মলগ্ন থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে বাংলা কবিতারা

মৌপিয়া মুখার্জী, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 18.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The topic of the essay is 'Bengali Poetries in Bengali Cinema since the birth of the 21st Century'. Generally, different types of songs are used to create the ambience of scenes in cinema. But the use of poetry to create the mood and sense of the background is really interesting! Here, words, verse, meter, and the significance are the determinants of the whole scene. It's not at all a 'common' thing to use poetry in Bengali cinema. But some directors have made use of Bengali poems for this purpose and created a magic indeed! Here, the most important factor is Imagery. Both in Cinema and Poetry, the focus of perception is the ability to think and feel, the magic of thought and language in poetry, and of sight and sound in film. Incessantly, there is poetry in film, film in poetry, or altogether with an indescribable feeling. Twenty-one Bengali films where Bengali poetries have been used in a stunning way, are discussed in this essay. When a camera is placed in place of a pen, poetry becomes a moving art. Symbols are created through a scene in a film. A scene of the film becomes a word of the poem, the 'sequence' is its foot, and the 'cut' is like various punctuation marks. The world is a collection of dynamic images. It is an endless film itself. As Shakespeare said, life is a moving stage. The language of any poem needs to have explanatory quality, image quality, and film quality. When the feeling of motion and mystical perception of poetry is combined with the atmosphere of the film, a mental relief is created. Sometimes movies become poetic, and poetry sometimes becomes cinematic also. In this essay, it is discussed how the poetries have been used in films, whether they have been treated properly or not, what the impact of those poems is, whether there is any limitation to use poetries in each type of film, and above all, the importance of making such poetic films is the primary outline of the essay.

Keywords: Poetry, Bengali, Cinema, Ambience, Imagery, Scene, Significance, Language, director, verse

সাধারণত চলচ্চিত্রের আবহে মিশে যায় গানের কথা ও সুর। কিন্তু, বেশ কিছু চলচ্চিত্রে দৃশ্যটির যাবতীয় না-বলা সবকিছুকে জাপটে ধরে কয়েকটা শব্দ...পরপর...কবিতার আলতো হাত আগলে রাখে সমস্ত অনুভূতি। দৃশ্যের আবহ নির্মাণ করে দেয় কয়েকটা শব্দ, ছন্দ। চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যের মাধ্যমেই প্রতীক নির্মিত হয়। চলচ্চিত্রের এক একটা দৃশ্য যেন হয়ে ওঠে কবিতার এক একটি শব্দ, সিনেমার 'সিকোয়েন্স' তার চরণ আর 'কাট' হল নানা যতিচিহ্ন। কখনও চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে কবিতাময়, কবিতাও কখনও চলচ্চিত্রময়। কবির অভিপ্রায়ের ব্যাঞ্জনায় শব্দ যেন গতিশীল হল মুদ্রনযন্ত্রের কৌশলে। "সে মিলিয়ে যায়"-এই বাক্যটিকে যদি

বর্ণের ক্রমশ বড় থেকে ছোট মাপে লেখা যায় বিশেষ কৌশলে, সেটা দেখেও মনে হবে যেন 'সে' মিলিয়ে যাচ্ছে। নির্বাক যুগের কোনো কোনো চলচ্চিত্রকেও ভোলা যায় না। কিন্তু, ধ্বনি চলচ্চিত্রে প্রাণ আনে। ভারতীয় সিনেমার আচার্য, চলচ্চিত্রকার দেবকী কুমার বসু তাঁর 'অর্ঘ্য' ছবিটিতে (১৯৬১ সালে) রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী', 'দুই বিঘা জমি', 'অভিসার' এবং 'পুরাতন ভৃত্য'- এই চারটি কবিতার চলচ্চিত্র রূপ দেন। বাংলা কবিতা থেকে অন্যান্য ভাষাতেও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতা অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে বিমল রায় পরিচালিত হিন্দি চলচ্চিত্র 'দো বিঘা জমিন'। তবে সিনেমার বহু দৃশ্যেও আবহে জুড়ে দেওয়া হয় কবিতা। শব্দপ্রয়োগ, ভাষার কৌশল, অনুভবের প্রকাশভঙ্গি অসাধারণ দৃশ্যগত ইমেজ তৈরি করে। চলচ্চিত্র ও কবিতা, দুই ক্ষেত্রেই উপলব্ধির মূল জায়গা হল মনন-চেতন ও অনুভব করার ক্ষমতা। কবিতার ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার জাদু এবং চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও শব্দের। অনবরত চলতে থাকে চলচ্চিত্রে কবিতা, কবিতায় চলচ্চিত্র কিংবা সবমিলিয়ে এক অবর্ণনীয় অনুভব। অনেকসময় বলা হয়, "দৃশ্যটা ঠিক কবিতার মতন!"... তবে কবিতা নিজেও নির্মাণ করে দৃশ্য, যা ঠিক জীবনের মতন!

একুশ শতকের জন্মলগ্ন থেকে কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা কবিতার মেলবন্ধন:

অসুখ (১৯৯৯):

ঋতুপর্ণ ঘোষের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি 'অসুখ'।

পরিচালক বলেছিলেন, 'অসুখ' সিনেমাটি তিনি তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি অবলম্বনে। প্রতারক প্রেমিক(অভিনয়ে-শিলাজিৎ মজুমদার), অসুস্থ মা ও বয়সভারে শ্রান্ত বাবা-এই তিনজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি একা মেয়ে কাঁধে অনেকখানি দায়িত্বভার নিয়ে কীভাবে সকলের চোখের আড়ালে হারিয়ে যায় ক্রমশ, তার অন্যতম নিদর্শন 'অসুখ'। মেয়েকে ডানার মতন নিবিড় যত্নে আগলে রাখতে চাওয়া বাবা বুঝতে পারেন, মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ রাতে ঘুমের ওষুধ খায়! এই দৃশ্যে আবহ নির্মাণ করল 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি-

"...নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি,
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে,
'হারিয়ে গেছি আমি!'..."
(অপর্ণা সেনের কণ্ঠে)

- "কী হয়েছে বামী?"র উচ্চারণে যেন বাবা-মা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। সেই মিলিত উদ্বেগ স্নেহশীল চারটে হাত বাড়িয়ে যেন বলছে, "মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে/ আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে।" প্রেমিকের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কান্নায় ভেঙে পড়া রুনুর হয়ে আবহ বলছে,

"ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,..."
('শুভক্ষণ', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর')

রুনু জানে মনে মনে, "ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূরপুরে...", রুনু আর ফিরে পাবে না অনিরুদ্ধকে! অসহনীয় যৌবন ভেঙেচুরে মায়ের সঙ্গে শৈশবের সঞ্চয়িতাতেই ফিরে যেতে ইচ্ছে করে রুনুর। মা বলেন, "তোর হোরিখেলার ঐ জায়গাটা মনে আছে?"...মা-মেয়ে একসঙ্গে বলতে থাকে-

"ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।

বোল ধরেছে আম্রবনে- বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে-..."
('হোরিখেলা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মা বলেন, "সঞ্চয়িতা পড়ে তোকে কত ঘুম পাড়িয়েছি ছোটবেলায়। তুই হঠাৎ ঘুমের ওষুধ ধরলি কেন রে!" আবহ জুড়ে বেজে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'খেলাভোলা' কবিতাটি।

"... খেলাভোলার দিন মা আমার আসে মাঝেমাঝে..."
(কণ্ঠে- দেবশ্রী রায়, অপর্ণা সেন)

চোখের লেন্সটা খুলে রাখার সময় রুনু কোনোমতে আটকে নেয় অশ্রু। যাবতীয় গৃহস্থালী সামলায় সে। অথচ, এ অবস্থায় তার মনে যা ধ্বনিত হওয়াই স্বাভাবিক অনবরত, তাই শোনা যায় আবহে, রবীন্দ্রনাথের 'অসম্ভব' কবিতাটি-

"...শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।"

কবিতার সহায়তা ছাড়া হৃদয়ের অতলের এই অসীম যন্ত্রণাকে ছোঁয়ার সাধ্য অন্তত এই অ-সুখের জন্য আর কিছুর নেই!

পারমিতার একদিন (২০০০):

অপর্ণা সেন পরিচালিত এই সিনেমাটি পারমিতার (অভিনয়ে- ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) একটি মিথ্যে বিবাহিত জীবনের তথাকথিত 'সংসার'এর কাহিনি। কিন্তু এই অজানা জীবনে পারমিতার একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার শাশুড়ি-মা সনকা (অভিনয়ে-অপর্ণা সেন)। পারমিতা লুকিয়ে কবিতা লেখে, সনকা ধরে ফেলে। পারমিতাকে শোনাতে বলে কবিতাটা। প্রথমে একটু লজ্জা পায় পারমিতা। সনকা অভিমানী স্বরে প্রমাণ করতে চায় যে সে-ও একসময় কবিতা পড়ত! অভিমানী সনকা প্রবল উৎসাহে মুখস্থ বলতে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'দূরের পাল্লা' কবিতাটি-

"ছিপখান তিন-দাঁড় -
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দেয় দূর-পাল্লা!..."

কবিতাটার ছন্দের গতিশীলতা ও অপর্ণা সেনের বলার ভঙ্গি দৃশ্যটিকে অন্য এক মাত্রা দান করে। সনকা যেন এই ছন্দের হাত ধরেই ফিরে যেতে থাকে তার শৈশবে। এরপর পারমিতা তার লেখা কবিতাটা সনকাকে শোনায়। কবিতাটার নাম 'আত্মজ' (সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় রচিত)।

"দীর্ঘ, বড় দীর্ঘ ছিলো শীত,
রুক্ষ, বড়ো রুক্ষ ছিলো পথ-ও,
তবুও তোকে আনতে গিয়ে একা,
সয়েছি বুকে রক্তঝরা ক্ষত।..."

এই কবিতাটা পারমিতার সম্পূর্ণ জীবনচিত্র। তার একমাত্র ছেলে শারীরিকভাবে অস্বাভাবিক, হাঁটাচলা করতে পারে না, কথা বলতে পারে না। সেই ছোট্ট মনের অসহায়তা নিয়ে লড়াই পারমিতার একার। আবার কোথাও যেন কবিতাটা মানসিক ভারসাম্যহীন সকলের 'বোঝা' মেয়ের মা সনকারও!

এক যে আছে কন্যা (২০০১):

সুব্রত সেন পরিচালিত এই সিনেমাটি অঞ্জন-রূপার (অভিনয়ে- যথাক্রমে সব্যসাচী চক্রবর্তী ও দেবশ্রী রায়) দীর্ঘকালীন সম্পর্কের মাঝে আচমকা এসে পড়া মানসিক ভারসাম্যহীন রিয়ার (অভিনয়ে-কঙ্কনা সেন শর্মা) নানা কার্যকলাপের গল্প। রিয়াদের বাড়িতে ভাড়া থাকতে শুরু করে অঞ্জন। রিয়া আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। রূপাকে অসহ্য মনে হতে থাকে রিয়ার। অঞ্জন-রূপার একান্ত আলাপের ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরে অঞ্জনের বলা একটা কবিতা-

"আসলে কেউ বড় হয়না, বড়র মতো দেখায়,
নকলে আর আসলে তাকে বড়র মতো দেখায়,
গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কত ছোট..."
(শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতা- 'বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো')

রূপা ও অঞ্জনের ভালোবাসার বারবার বজ্রপাতে রূপাকে আশ্বস্ত করে অঞ্জন বলে যায়-

"আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয়না
মৃত্যু হয়না-
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম..."
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা 'জন্ম হয়না, মৃত্যু হয়না')

শেষপর্যন্ত অঞ্জনের ভালোবাসার কোনো জন্ম-মৃত্যু ঘটেনি। রিয়াকে যেতে হয়েছে মানসিক হাসপাতালে। অঞ্জনের 'জন্ম-কবচ' রূপাকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জন চলে গেছে বিবাহিত জীবনের পথে।

তিতলি (২০০২):

ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত 'তিতলি' সিনেমায় দেখি উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের চা-বাগান গৃহিণী ঊর্মির (ঊর্মিলা চ্যাটার্জী) (অভিনয়ে-অপর্ণা সেন) রোজনামচার মাঝে হঠাৎ একদিন মুখোমুখি হওয়া ফেলে আসা প্রেমিক রোহিত রায়ের। প্রায় কুড়ি বছর ধরে চা-বাগানের কুয়াশার কারাগারে বন্দি আছে ঊর্মি। না, 'বন্দি' বলা ভুল হবে! টি-এস্টেটের ম্যানেজারের স্ত্রী ঊর্মি সুখেই আছে!

বিবাহিত ঊর্মির থেকে রোহিতের বাধ্যতামূলক সরে যাওয়ার শীতঘুম ধরা পড়ে তাদের দুজনের কথোপকথনের কয়েকটি পঙতিতেই-

"আধেকলীন-হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া"

কল্পনার অধরা স্বপ্নে তাদের একসঙ্গে বসবাসের জীবনকে কী অদ্ভুতভাবে পরিচালক মিলিয়ে দিলেন রবি ঠাকুরের 'এক গাঁয়ে' কবিতায়। ঊর্মির কণ্ঠে এই চরণগুলির উচ্চারণ যেন মেঘের স্তরে স্তরে এঁকে দিতে থাকে তাদেরই না হওয়া কিংবা হতে পারা এক জীবন!

"আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি,
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।"

ভালো থেকো (২০০৩):

গৌতম হালদার পরিচালিত সিনেমা 'ভালো থেকো' একটা ভালো না থাকার গল্প। আনন্দীর (অভিনয়ে-বিদ্যা বালান) প্রেম নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকতে চায় প্রকৃতির সঙ্গে। সেই যোগসূত্র আনন্দীর প্রেমিক বাবুয়ার (অভিনয়ে-জয় সেনগুপ্ত) ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে কবিতা বোঝে না। সে বোঝে না কেন জন্মদিনে গাছ লাগানো হয় আনন্দীদের বাড়িতে। আনন্দীর বোন ঝিনুকের (অভিনয়ে-রিমঝিম গুপ্ত) প্রেমিক দীপ (অভিনয়ে-পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) বুঝতে পারে গাছেদের কথা। দীপ টের পায় আনন্দীর সঙ্গে গাছেদের কতরকম কথা হয়। গাছ লাগাতে লাগাতে দীপ আনন্দীর অনুরোধে হঠাৎ বলে ওঠে একটা কবিতা,

"...বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন পানে একা,
দৌড়ে গিয়ে, ভেবেছিলাম তোমার পাব দেখা..."
(শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতা 'যখন বৃষ্টি নামলো')

ঝিনুক একদিন দীপের সঙ্গে প্রতারণা করে চলে যায় অন্য একজনের কাছে। আর বাবুয়া বিলেতে পড়তে গিয়ে হঠাৎ একদিন চিঠি লিখে জানায় যে সে ওখানকার এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। বিচ্ছিন্নতায়, যন্ত্রণায়, তীব্র আঘাতে জ্বলতে থাকে পড়ে থাকা দুটো কবিতা-আনন্দী ও দীপ। একদিন বাবুয়া ফিরে আসে দেশে। আনন্দীকে বলে, "আমি তোকে মুক্তি দিতে এলাম রে বুড়ি!"

আনন্দী এগিয়ে যায় সেই গাছটার দিকে, যে গাছের সঙ্গে জুড়ে আছে দীপের কবিতা, তার নিজের অনেকদিনের জমানো কান্না। আনন্দীর দাদা বৈপ্লবিক কাজে একদিন বেরিয়ে যায়, আর ফেরেনি। দাদার জন্য এই গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে অনেক কেঁদেছে সে, বাবুয়ার জন্যেও! সেই গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দী। সমস্ত হাসি-কান্না-মান-অভিমান-কষ্টদের জড়িয়ে সে বলে-

"ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল, ভালো থেকো।
ভালো থেকো ধান, ভাটিয়ালি গান, ভালো থেকো..."
(হুমায়ুন আজাদের কবিতা 'ভালো থেকো')

আলো (২০০৩):

তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'আলো' সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কিন্নরদল' গল্প অবলম্বনে। সিনেমার শুরুতে কলাকুশলীদের নামগুলি যখন দৃশ্যে ভেসে যায়, তখন অপূর্ব গ্রাম্য প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অবলম্বন করে আবহে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির নির্বাচিত অংশপাঠ অপূর্ব অনুভূতি সৃষ্টি করে।

"নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।..."

দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে দেখা যায় গ্রাম্য কুটির, গোয়ালঘর, অবারিত মাঠ, দিঘীর জল, কলসি কাঁখে হেঁটে যাওয়া বঙ্গের বধূদের।

দোসর (২০০৬):

ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত এই সিনেমায় দেখা যায় কাবেরী (অভিনয়ে-কঙ্কনা সেন শর্মা) জানে তার জীবনসঙ্গী কৌশিক গেছে অফিস ট্যুরে। আচমকা আসে টেলিফোন। অ্যাকসিডেন্ট! হাসপাতালে বেশ কয়েকদিন ভর্তি থেকে অবশেষে বাড়ি ফিরে আসে কৌশিক (অভিনয়ে-প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়)। কাবেরীর সামনে উন্মোচিত হয় অন্য এক রহস্যজাল। কৌশিকের সঙ্গে দুর্ঘটনার সঙ্গী হয়ে মৃত্যু হয়েছে মিতার (অভিনয়ে-চান্দ্রেয়ী ঘোষ)।

কাবেরী বোঝে, মিতার সঙ্গে এতকালের সাহচর্য কোনো অফিস ট্যুর নয়! কৌশিকের ফোনে একটা এস.এম.এস পায় কাবেরী, সম্ভবত মিতার পাঠানো।

"তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁট ছুঁলো
যদিও এ প্রথমবার নয়,
চুম্বন তো আগেও বহুবার
এবার ঠোঁটে মিলেছে আশ্রয়..."

সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এই 'চুম্বন' কবিতাটি এই সিনেমার প্রতিটি ঘটনাকে যেন উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দেয় দর্শককে। কবিতাটির প্রথম কিছুটা কৌশিক-কাবেরীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে কাবেরীর কণ্ঠে। বাদবাকিটা মিতার কণ্ঠে আবহ হিসেবে।

"...আসলে তুমি দীর্ঘ শাল-মূলী
সবার মাথা ছাড়িয়ে তোর বর
তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁট ছুঁলো
আর যা কিছু-
অকিঞ্চিৎকর।"

অদ্ভুতভাবেই, কবিতাটি কাবেরী ও মিতা-উভয় কণ্ঠ মিলে সমাপ্ত করেছে। বাস্তবেও তো কাবেরী ও মিতা উভয়ের কথাই এক! তারা মিলেমিশে যায়। দিনের শেষে তারা দুজনেই নারী এবং পুরুষতন্ত্রের শিকার। ক্ষমাশীল এই নারীদের মাঝে কৌশিকের মতন 'রাজপুত্রের জয়' হয় সম্পর্কের অন্ত্যঃমিলে। বাকি যা কিছু ভুলচুক, ওঠাপড়া সবটাই তো টিকে থাকার কাছে 'অকিঞ্চিৎকর'!

যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল (২০০৭):

জয় গোস্বামীর রচনা 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' অবলম্বনে, অঞ্জন দাস পরিচালিত এই সিনেমায় রাধার ধরা দেওয়া হয়নি অরণির (অভিনয়ে-জয় সেনগুপ্ত) কবিতার পঙতিতে। রাধার (অভিনয়ে-ইন্দ্রানী হালদার) বিয়ে হয়ে যায় অন্যত্র। সেখানে রাধা 'বাধ্য গৃহবধূ' এবং 'স্বামীর ভোগ্যবস্তু' ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিন বাড়িতে রাধা একা। মুষলধারে বৃষ্টি নামল বাইরে। মেঘের গর্জনে ছাদের একপাশে বসে রাধা পড়তে লাগল অরণির সেই কবিতাগুলো, অরণি নিজের হাতে লিখে একটা মেঘলা দিনে রাধাকে দিয়েছিল। প্রাকৃতিক মেঘাচ্ছন্নতা ও রাধার জীবনের বৃষ্টিধারায় সেই কবিতা অনায়াসেই রাধাকে নিয়ে গেল অরণির স্মৃতিপথে। কবিতাটা পড়তে পড়তে রাধা তখন বর্তমানের কেউ নয়, সে কেবল অরণির সেই 'মেঘবালিকা'!

"আমি যখন ছোট ছিলাম
খেলতে যেতাম মেঘের দলে
একদিন এক মেঘবালিকা
প্রশ্ন করল কৌতুহলে
'এই ছেলেটা নাম কি রে তোর?'
আমি বললাম, 'ফুসমন্তর!'..."
(জয় গোস্বামী রচিত 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা' কবিতা)

এই কবিতার আবহে দেখানো হয়েছে অরণিকে, রাধাকে...দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজে একাকার, বিচ্ছিন্নভাবে! আকাশ কালো করে তারা ভিজছে...পুড়ছে দুটো ভগ্ন হৃদয়!

অরণির যখন বেশ নামডাক হয়েছে, একদিন এক পাঠককে কবি অরণি একটা পাতায় লিখে দিয়েছিল-

"অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে..."
(জয় গোস্বামী রচিত– 'হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে')

সেই পাঠক, সেই নারী কবির 'ডুবে মরা'কে জুড়ে নিয়েছিল নিজের নারীত্বের অতলতায়। অরণি তাকে আরও একটা কবিতা দিয়েছে, দু-লাইন পড়ে শোনায় সে, এলোমেলো।

মূল কবিতাটি-

"এতদিন জলে আছি। আজ দিন আগুনে কাটুক।..."
(জয় গোস্বামী রচিত কবিতা '২০শে নভেম্বর, সকাল')

অরণি তখন রীতিমতন এক কবি! তার কবিতাপাঠের সভা হয়- 'অরণির সঙ্গে এক সন্ধ্যা'। সেই কবিতায় অরণি পাঠ করে তার লেখা কবিতা-

"ফিরে এলাম সরল পথ অতিক্রম করে
যত এগোই লতার পরে লতা
পায়ের গোছ আঁকড়ে ধরে-ছাড়াতে গিয়ে দেখি
হীরেমানিক জ্বালানো জটিলতা।
...
হীরেমানিক-বোনের পাশে ভাই।"
(জয় গোস্বামী রচিত কবিতা 'রূপকথা')

এই কবিতায় হয়ত বা উঠে এসেছে অরণির প্রেম-বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দিদির কথা!

জয় গোস্বামীর উপরিউক্ত কাব্যগ্রন্থেই 'শ্রাবণ' নামে একটি দু-পঙতির কবিতা আছে।

"ওই মেয়েটির কাছে
সন্ধ্যাতারা আছে।"

সেই পাঠকের বাড়ি রাত্রিবাসকালে কবি স্বপ্নে পেল সমুদ্রের তীরে পড়ে থাকা কাগজের নৌকায় লেখা একটা না হওয়া কবিতার চার-লাইন-

"চাঁদের গায়ে উল্কা পড়া গর্ত
চাঁদের গায়ে ধুলো হয়ে যাওয়া কোটি বছরের উল্কা
চাঁদের খুলিতে হাজার মাইল কাটা দাগ
চাঁদের মগজে শুকিয়ে বালি হয়ে যাওয়া সমুদ্র..."
(জয় গোস্বামী রচিত কবিতা 'চন্দ্রাহত')

কবি তখন সত্যিই চন্দ্রাহত, যদি ধরে নিই সেই পাঠক মেয়েটি চাঁদ। কবি যদি চাঁদ হয়, তবে তার গায়ে কলঙ্কের গর্ত হবে আজ রাতে। এতকাল সেই চাঁদের গায়ে লেগেছিল রাধার উল্কাপিন্ড! তার প্রেমের সমুদ্র এতদিনে অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে শুকিয়ে একেবারে বালি হয়ে মিশে গেছে অতলে!

প্রভু নষ্ট হয়ে যাই (২০০৭):

সিনেমাটি অগ্নিদেব চ্যাটার্জী পরিচালিত। সামগ্রিকভাবেই এটি আদতেই সম্পর্ক, মূল্যবোধ, সততা ও সত্যতার নষ্ট হয়ে যাওয়ার গল্প। পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্বাস, ভরসা সমস্তটাই ধামাচাপা পড়ে যায় অত্যন্ত কদর্যতায়!

সিনেমার শুরুতে কলাকুশলীদের নাম প্রদর্শনের সময় শিলাজিৎ মজুমদারের কণ্ঠে আবহ নির্মাণ করেছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই' কবিতাটি

"বার বার নষ্ট হয়ে যাই
প্রভু, তুমি আমাকে পবিত্র
করো, যাতে লোকে খাঁচাটাই
কেনে..."

'নষ্ট' যা কিছুকে প্রকট করতে সমগ্র সিনেমাটি সাদা-কালো দৃশ্যে ভরপুর।

সব চরিত্র কাল্পনিক (২০০৯):

কাব্যের বুননেই চরিত্রগুলিকে সাজিয়ে তুলেছেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। চরিত্রগুলো কাল্পনিক কি না জানা নেই, তবে চরিত্রগুলি যদি কবিতার এক একটা চরণ হয়, তবে তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে গেছে এক অনবদ্য অন্ত্যমিলে। সিনেমার অনেকখানি অংশই সিনেমাটির নায়ক ইন্দ্রনীল মিত্রের (অভিনয়ে-প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) কবিতা অবলম্বনে নির্মিত। ইন্দ্রনীল ও তার স্ত্রী রাধিকার (অভিনয়ে-বিপাশা বসু) জীবনের নানা মিলন-বিরহের কথা বলে যায় ইন্দ্রনীলের ঐ কবিতাগুলো। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ছাড়া বাকি কবিতাগুলির রচয়িতা জয় গোস্বামী। বোহেমিয়ান, বেখেয়ালী, ভুলোমনের এক পাগলাটে বিবাহিত কবি ইন্দ্রনীল মিত্র। ইন্দ্রনীলের চেয়ে রাধিকার অনেক বেশি ভরসাযোগ্য মনে হয় তার (রাধিকার) অফিসের সহকর্মী শেখরকে (অভিনয়ে-যীশু সেনগুপ্ত)। ইন্দ্রনীলের কল্পনা ও শেখরের বাস্তবতা- এই দুইয়ের মধ্যে রাধিকার টানাপোড়েন কবিতার মতন করে এঁকেছেন ঋতুপর্ণ। সিনেমার শুরুতে বিপাশা বসুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ শোনা যায় আবহে-

"Our little river twists and turns
In May its water needy prunes
Cows bathe across carts bail through
Banks are high and sloping too"
(ইংরেজি অনুবাদে- মধুছন্দা কার্লেকর)

রাধিকা নির্দ্বিধায় বলতে পারে, "I was too lazy to think something original..."

বিয়ের পর ট্রেনে করে জামশেদপুর থেকে কলকাতা আসার সময় একটা ছোট নদী দেখেছিল রাধিকা, তার বিবাহিত দিনগুলোর মতন।

দেশভাগের পর ঘরবাড়ি ওদেশে ফেলে চলে আসে নন্দর মা। তার নাম প্রিয়বালা দাস (অভিনয়ে-সোহাগ সেন)। ইন্দ্রনীলের মৃত্যুর পর সে রাধিকাকে জানায়, "আমার সঙ্গে গালগপ্প করত তো, তখন জিগাইসে, আমি কইসি"...যদিও, তার জীবনের কিছু কিছু অংশ ইন্দ্রনীল কল্পনা করে নিয়েছে তার কবিতায়। প্রিয়বালারা দুই বোন আলাদা হয়ে যায়নি। প্রিয়বালা বলে, "বানায় বানায় লিখসে!"...তবু, এ কবিতা শুনে নন্দর মা লুকিয়ে চোখের জল মোছে। এ কবিতা ইন্দ্রনীলের স্মরণসভায় পাঠ হতে শুনে রাধিকা চঞ্চল হয়ে পড়ে। পাঠ করেন জয় গোস্বামী নিজেই।

"সেই কোন দেশে আমরা যাচ্ছিলাম
কোন দেশ ছেড়ে আমরা যাচ্ছিলাম ...
ছোটবোন আর মা বাবা, গ্রামের লোক
তার পাশে আমি, দুলালী? না প্রিয়বালা?..." ('নন্দর মা')

স্মরণসভায় একজন আনলেন ইন্দ্রনীলের কবিতার প্রথমদিকের নায়িকা 'কাজরী'র (অভিনয়ে-পাওলি দাম) প্রসঙ্গ।

রাধিকা যেন নিজের বেশেই দেখতে পাচ্ছে কাজরীর ছায়া।

"এই তো আমার সঙ্গে কেঁদুলির মেলা
এই তো আমার সঙ্গে বাউলের ঘর
উড়ছে শীতের রাত লালন-এর গানে
কাজরীর সঙ্গে শুধু জ্বর।

...

জ্বর কি তোমার কোন পুরনো প্রেমিক?
ইস্কুল বয়েস থেকে সে এসে তোমার পাশে বসে?
যখন থাকি না আমি?
সে আমার হাত থেকে নিক, তবে অভিশাপ নিক

...

সে জ্বলুক, যেরকম কৃতকর্ম জ্বলে।"
('কাজরীর জ্বর) (পাঠ: পল্লব কীর্তনীয়া)

রাধিকার মনে পড়ে যায়, একবার বন্ধুদের সঙ্গে কেঁদুলির মেলায় গিয়েছিল ইন্দ্রনীল। রাধিকার তখন ধুম জ্বর! রাধিকা ভেবেছিল, ইন্দ্রনীল সে জ্বরের তোয়াক্কা করেনি। অথচ, সে এক আস্ত কবিতা! রাধিকার যে সত্তার নাম 'কাজরী', সে ধরা দেয়নি ইন্দ্রনীলের কাছে। অথচ ইন্দ্রনীল ভাবত, "কাজরী, উড়িয়ে আনব তোমায় এখানে..."! ক্রমশ শেখরের দিকে উড়ে যাওয়া রাধিকার 'কাজরী' হয়ে ওঠা হয়নি আর!

একবার হাঁসকুড়ি নদীর কাছে একটা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে রাধিকা একটা কবিতা লিখেছিল। তারপর সেটি হারিয়ে যায় ফেরার রাস্তায়। এ কথা শুনে কবিতাটির জন্য কাতর কবি ইন্দ্রনীল বলেছিল, "অলকানন্দার জলে কবিতাটাকে একা রেখে চলে এলে? ও কীকরে পথ চিনে আসবে!"... 'হাঁসকুড়ি' নামটা পছন্দ হয়নি বলে ইন্দ্রনীল নদীটার নাম দেয়, 'অলকানন্দা'।

ইন্দ্রনীলের জীবদ্দশায় তার অতলতার সাক্ষাৎ পায়নি রাধিকা। অলকানন্দার জলে ভেসে গেছে তাদের ব্যর্থ দাম্পত্য। মৃত্যুর মতন চরম এক সত্যের সামনে রাধিকার আজ মনে হচ্ছে, "I wanted to leave you neel, but I didn't want you to leave me!"

রাধিকার দরকারি কাগজপত্র দিয়ে মৃত্যুর পরেও এসে এরোপ্লেন বানিয়ে উড়িয়ে দেয় ইন্দ্রনীল। রাধিকা দেখতে পায় এমন দৃশ্য। পরপর কিছু দৃশ্যে দেখি, রাধিকার কল্পিত কাজরী আর রাধিকা একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে।

আবহে ভেসে আসছে ইন্দ্রনীলের কণ্ঠে তার কবিতা-

"আজ আর আমাদের ঘুম আসবে না, চলো
ছাদে দাঁড়াই
ছাদ কোথায় পাবো, আমাদের মাথার ওপর তো
আর দুজন ঘুমোচ্ছে!..."
('১৪ জুলাই', জয় গোস্বামী)

নন্দর মায়ের কাছ থেকে রাধিকা ইন্দ্রনীলের একটা কবিতার প্লট শুনে চমকে ওঠে। এ ভাবনা যে তার! বহুদিন আগে ইন্দ্রনীল একজনের বাড়িতে যায় একটা কাজে। বাড়িটার বাইরে ট্যাক্সিতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল রাধিকা। সেইসময় সে রাস্তায় একটা পাগলকে দেখে ভয় পায়। তারপর একটা ভাবনা আসে তার মাথায়, ইংরেজিতে সে লিখে রেখেছিল ভাবনাটা। সেই অনুভব নিয়ে মৃত্যুর দুদিন আগে ইন্দ্রনীল একটা কবিতা লিখে গেছে।

"আমার সবচেয়ে ভয় হয় আমার ঘরের মানুষটাও যখন বলে এবার পাগল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাব একদিন যদি সত্যিসত্যিই বেরিয়ে যায় মাথাগরম লোকটা..."

রাধিকা উদঘাটন করে, ইন্দ্রনীলকে সে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই, তার 'পাগল' কবি কোথায় হারিয়ে যাবে, কীভাবে বাড়ি খুঁজে ফিরে আসবে আর ফিরতে না পারলে কোনো অভাগিনীর ঝুপড়িতে খসে পড়বে কি না, এসব তাকে ভাবায়!

প্রথমদিকের এক দৃশ্যে চলন্ত ট্রেনের কামরায় দেখেছিলাম সদ্য বিবাহিত রাধিকার উজ্জ্বল, রঙিন হাত। শেষ দৃশ্যে চলন্ত ট্রেনের জানালায় রাখা আছে রাধিকার অকাল বৈধব্য জড়িত একটা ক্লান্ত হাত। আবহে ভেসে আসছে রাধিকার কণ্ঠে বাংলা কবিতা।

"আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।..." (রবীন্দ্রনাথ)

ছোটদের জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার কয়েকটা লাইনকে কি অপূর্ব ভঙ্গিমায় মানুষের সম্পর্ক-জীবন-মৃত্যুর মাঝের স্রোতধারা হিসেবে জুড়ে দিলেন পরিচালক! সিনেমার পোস্টার ও ডিভিডি'তে লেখা আছে,

"অর্ধেক লিখেছ মৃত্যু
বাকি অর্ধ সেতুর ওপারে।"
('মৃত্যুবিষয়ক', জয় গোস্বামী)। মৃত্যুতে জন্ম হয় জন্মকালীন অনেক অধরার।

অন্তহীন (২০০৯):

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী পরিচালিত 'অন্তহীন' আই.পি.এস অফিসার অভীক চৌধুরীর (অভিনয়ে-রাহুল বোস) অন্তহীন কল্পনার জগতের গল্প। চারপাশের তথাকথিত সম্পর্কগুলো দেখে দেখে সে বিধ্বস্ত। সে চায় একান্ত নিজস্ব একটা নীরবতা। সে 'অনলাইন ফ্রেন্ডশিপ' গড়ে তোলে সম্পূর্ণ অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির নাম বৃন্দা (অভিনয়ে-রাধিকা আপ্তে)। অন্যদিকে পারো (অভিনয়ে- অপর্ণা সেন) ও রঞ্জন (অভিনয়ে- কল্যান রায়) স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন যুগল। তাঁরা প্রৌঢ়ত্ব ছুঁয়েছেন, অভিজ্ঞ। তাই নিছক এক আড্ডায় অভীককে রঞ্জন বলেন, "ইন্টারনেট লাভ গেমস্ একেবারে টিন-এজারদের!...তোর বয়সে এসব মানায় না!" ...অভীক বলে, "গেম নয় রঞ্জু'দা।...ইমোশানাল এসকেপ বলতে পারো!...অপেক্ষা!" ঠিক এসময় রঞ্জনের কণ্ঠে শুনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মানুষ' কবিতাটি।

"তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে,
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।
তবু এখনও সে মুখ
দেখে চমকায়,
এখনও সে মাটি পেলে

প্রতিমা বানায়।"

(সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'গণসংগীত সংগ্রহ' কাব্য সংকলন)

এক সদ্য প্রস্ফুটিত প্রেমিক সত্তার সামনে এই কবিতার পঙতিগুলি উচ্চারণ করছে এক বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত হৃদয়। সে হৃদয়ের মন ভেসে গেছে অশ্রুজলের অতলতায়, ঘর পুড়ে গেছে সম্পর্কের অকাল দহনে। তবু, কোনো নতুন প্রেমময় মুখ এখনও তাঁর মনে আশা জাগায় নতুন বন্ধনের প্রতিমা বানাতে!

কালবেলা (২০০৯):

গৌতম ঘোষ পরিচালিত সিনেমা 'কালবেলা' নির্মিত হয়েছে সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' উপন্যাসটিকে ভিত্তি করে। নকশাল আমলের উত্তাল সময়ে কলেজ-ছাত্র অনিমেষের (অভিনয়ে-পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) মেস-জীবনের যৌবনকাল তুলে ধরা হয়েছে দুটি কবিতার প্রয়োগে। দুটি কবিতাই শোনা যায় অনিমেষের মেস-বন্ধু ত্রিদিবের (অভিনয়ে-রুদ্রনীল ঘোষ) কণ্ঠে। এক রাতে মত্ত অবস্থায় মেসে ফিরতে ফিরতে ত্রিদিব বলতে থাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' কবিতাটি।

"পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে..."

ত্রিদিবের স্বপ্নে কেউ ঘুরপাক খায়। কবিতার মধ্যে দিয়ে তাকে ছুঁতে চায় ত্রিদিব, ভেঙে পড়ে নেশাগ্রস্ত কান্নায়! এই দৃশ্যে ত্রিদিবের কণ্ঠে শোনা যায় জীবনানন্দ দাশের 'জনান্তি' কবিতাটি

"তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই- তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই- তুমি
আজো এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছ..."

কলেজ সহপাঠী মাধবীলতার প্রেমে পড়ে এক সকালে খানিক অন্যমনস্ক দেখায় বিপ্লবী অনিমেষকে। তাই অনিমেষের মনের ব্যাকুলতা বোঝাতে মজার ছলে ত্রিদিব বলে ওঠে,

"আকাশে তাকালাম
তোমার মুখ
চোখ বন্ধ করলাম
তোমার মুখ
বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ।"

(সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত কবিতা 'আমি আসছি')

অনিমেষের মনের অবস্থা তখন ঠিক তাই! তার এটুকু কথাতেই সেটা স্পষ্ট- "কবিরা কি মনের ডাক্তার হয়?"

ইতি মৃণালিনী (২০১০):

অপর্ণা সেন পরিচালিত এই সিনেমা দেখায় সারাজীবন একাধিক সম্পর্কে জর্জরিত, প্রতারিত মৃণালিনী (অভিনয়ে- অপর্ণা সেন ও কঙ্কনা সেন শর্মা) আত্মহত্যার রাতে চিঠিতে লিখে যাচ্ছে তার শেষ কিছু কথা। অভিনয় জীবনের সমস্ত হিসেব-নিকেশ পুরোপুরি না মিললেও, মৃণালিনীর কলম বারবার ফিরে যাচ্ছে তার প্রথম প্রেমের কাছে, যেখানে কোনো অভিনয় নেই! আজ ঘুমের ওষুধগুলো খাওয়ার ঠিক আগে, মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মৃণালিনী ছিঁড়ে ফেলতে চায় তার সমস্ত স্মৃতিপাতা (পুরোনো ছবি, উপহার...)। অতীত ঘেঁটে বেরিয়ে আসে তার প্রথম প্রেমিক অভিজিৎ-এর দেওয়া 'স্মৃতির শহর' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত) বইটি। মৃণালিনী প্রবল আকর্ষণে ফিরে যায় কলেজ-জীবনের বন্ধুদের প্রাণবন্ত আড্ডার সেই সমস্বর কবিতা উচ্চারণে-

"আমাকে টান মারে রাত্রি-জাগা নদী
আমাকে টানে গূঢ় অন্ধকার..."

কবিতাটির শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির উচ্ছ্বাস যেন যৌবনের উদ্দামতাকে প্রকাশ করে সিনেমায়। একইসঙ্গে, মৃত্যুর দরজায় দাঁড়ানো এক ক্লান্ত প্রাণকেও টান মারে তার রাত্রি-জাগা নদী, তার প্রথম সবকিছু। সেই টানেই সে পার্থিব খোলশ ছেড়ে রেখে চলে যেতে চাইলেও পারে না!

২২শে শ্রাবণ (২০১১):

সৃজিত মুখার্জী পরিচালিত এই সিনেমায় জটিলতা, রহস্য, আক্রোশ ইত্যাদির আবরণেও বারবার ফিরে এসেছে কবিতার ব্যবহার। 'নিবারণ' চরিত্রটির (অভিনয়ে গৌতম ঘোষ) পরতে পরতে জুড়ে আছে কবিতা। এই সিনেমার শেষ দৃশ্যে এক্স-ডিসিপি প্রবীর রয়চৌধুরী নিজে নিজেকে গুলি করে মৃত্যুবরণ করার আগের মুহূর্তে বলতে থাকা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র পঙক্তির ব্যবহার সত্যিই নজর কেড়েছে!

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও... হে বন্ধু, বিদায়"

গয়নার বাক্স (২০১৩):

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত ছোট গল্প 'রাসমনির সোনাদানা' অবলম্বনে গয়নার বাক্স চলচ্চিত্রটি নির্মিত। এটি এক বাঙালি হিন্দু জমিদার পরিবারের অকাল- বিধবা রাসমণির অতৃপ্ত স্বপ্নের গল্প। সেই গল্প শুধু রাসমণির থাকে না, পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় সেই স্বপ্নের নেশা। তথাকথিত সাংসারিক গন্ডির চৌকাঠ পার হয়ে সোমলতা ধরা দিতে যায় প্রেমিকের কাছে, যা রাসমণি পেরে ওঠেনি শেষমেশ, সোমলতাও না। একের পর এক প্রজন্মের ধামাচাপা দিতে থাকা বাসনার গল্পগুলো থেকে যায় কালের সত্য হয়ে, ধরা দেয় কবিতায়...

"সীমন্তিনী, তোমায় ডেকে পাইনি সাড়া
দুয়ার ঘিরে ছিল হাজার কাঁটার বেড়া...
একলা এলে পথ হারালে –
বনের পথে কেন আমায় পথ ভোলালে..."
('সোমলতাকে', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়)

এপার-ওপার মিশে যায় কবিতা থেকে গানে, দুই বাংলার হয়ে কথা বলে অধরা মুহূর্তরা- "ওপারের মেয়ে সব কাজ ফেলে তাই কি এলে!"

চতুষ্কোণ (২০১৪):

সৃজিত মুখার্জী পরিচালিত এই সিনেমা সম্পর্কের অতি জটিল সমীকরণ ও এক প্রতিশোধের গল্প বলে। সিনেমার ভেতর বাস্তব ও সিনেমা মিলেমিশে জট পাকিয়ে যায় এবং শেষ পরিণতি জয়ব্রতর (অভিনয়ে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) মৃত্যু। তবু, ধ্বংসের এই বিপুল আয়োজনেও জয়ব্রত তৃণাকে আচমকা মনে করিয়ে দেয় তার ফেলে আসা জীবন,

"ঠিক সময়ে অফিসে যায়?
ঠিক মতো খায় সকালবেলা?
টিফিনবাক্স সঙ্গে নেয় কি?
না ক্যান্টিনেই টিফিন করে?..." ('প্রাক্তন', জয় গোস্বামী)

কবিতা হয়ত এভাবেই তীব্র জটিল আবহতেও আনে প্রাণের স্পন্দন!

বেলাশেষে (২০১৫):

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সিনেমা 'বেলাশেষে'। এটি বিশ্বনাথ মজুমদার নামে এক বৃদ্ধের (অভিনয়ে-সৌমিত্র চ্যাটার্জী) দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর 'বিবাহিত' সম্পর্ক থেকে মুক্তির আকাঙ্খার গল্প। এই ইচ্ছে থেকেই পরিবর্তন ঘটে যায় একে একে অনেকগুলো সম্পর্কের। বাবা-মাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখে ছেলেমেয়েরা ফিরে তাকায় তাদের নিজের নিজের সম্পর্কের দিকে। এদের প্রত্যেকের ছেঁড়া ছেঁড়া সম্পর্কগুলোকে দু-লাইনেই স্পষ্ট করে দিয়েছে শঙ্খ ঘোষের 'সঙ্গিনী' কবিতা-

"হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়"

পঙক্তিগুলি সিনেমায় শুনি মালশ্রীর (অভিনয়ে- ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) কণ্ঠে, বিশ্বনাথ মজুমদারের মেজো মেয়ে। এই দুই পঙতি নিমেষেই বুঝিয়ে দেয় সম্পর্ক ও আজীবনের মধ্যেকার ব্যস্তানুপাতিক হিসেবের গল্প!

কাদম্বরী (২০১৫):

সুমন ঘোষ পরিচালিত এই সিনেমাটি রবিঠাকুরের বৌঠান কাদম্বরী দেবীর জীবনচিত্র। রবীন্দ্রনাথ (অভিনয়ে- পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) ও কাদম্বরীর(অভিনয়ে-কঙ্কনা সেন শর্মা) একান্ত আলাপচারিতায় রবির কবিতা নিয়ে কথপোকথনে রবি পড়ে শোনায় তার লেখা নতুন কবিতা, তার নতুন বৌঠানকে।

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।..."('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ')

এই কবিতার মধ্যে এক উজ্জ্বলতা আছে, প্রাণ আছে। এই প্রাণ যেন সিনেমার এই দৃশ্যে আরো বেশি করে ফুটিয়ে তোলে যুবক কবি রবির প্রখরতা,ঔজ্জ্বল্য এবং সেই ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় তার নতুন বৌঠানের প্রশংসা ও সাহচর্য। রবি বলছে, "আমার যেন কীসের ঘোর লেগেছে বৌঠান, আমি জানি না কীসের ঘোর!"

প্রাক্তন (২০১৬):

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সিনেমা 'প্রাক্তন' একটি প্রাক্তন সম্পর্কের রেলগাড়িতে হঠাৎ দেখা হওয়ার গল্প। সুদীপা (অভিনয়ে-ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) ও উজানের (অভিনয়ে-প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) প্রেম হয়, পরিণতি বিয়ে। কিন্তু মানসিকতার বিস্তর ফারাকে সেই বিয়ের পরিণতি বিচ্ছেদ। রেলগাড়ির এক কামরায় সুদীপার পরিচয় হয় মালিনী ও তার মেয়ে পুতুলের সঙ্গে। মাঝে এক স্টেশনে ঐ কামরায় আসে পুতুলের বাবা। সুদীপার সঙ্গে দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হয় উজানের, পুতুলের বাবার। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রায় একই কামরায় এই দুই প্রাক্তনের অন্তরের কথাগুলো ফুটিয়ে তুলতে আবহ নির্মাণ করেছে রবীন্দ্রনাথের 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি (কণ্ঠ: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)

রেলগাড়িটির পাশের কামরার সহযাত্রী এক বৃদ্ধ দম্পতি (অভিনয়ে- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী)। তাঁরা বিচ্ছিন্ন 'প্রাক্তন' দম্পতির সামনে এক জলজ্যান্ত বৈপরীত্য। দীর্ঘ পথ তাঁরা দুজন পাড়ি দিয়েছেন একসঙ্গে, দিয়ে চলেছেন।

"রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।..."

সিনেমার শেষের দিকে আসে ট্রেন থেকে একে একে নামার পালা। সুদীপার ভারী স্যুটকেস তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় উজান। কাছাকাছি আসে স্যুটকেসের ওপর রাখা দুটো হাত, যারা একে অন্যকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল সারাজীবন, পারেনি। এই দৃশ্যের আবহই তাদের কথোপকথন!

"... 'আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি?'
একটুকু রইলেম চুপ করে;
তারপর বললেম,
'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।..."

হঠাৎ দেখা (২০১৭):

রেশমি মিত্র ও সাহাদাত হোসেইন পরিচালিত এই সিনেমাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি অবলম্বন করেই নির্মিত হয়েছে। মানসী (অভিনয়ে- দেবশ্রী রায়) ও অমিতের (অভিনয়ে- ইলিয়াস কাঞ্চন) দেখা হয়েছে হঠাৎ এক রেলগাড়ির কামরায়। পূর্ণিয়ার গ্রামজীবনে ছিল তাদের কৈশোরের প্রেম। তারা আবার মিলিত হয় এক রেলগাড়ির কামরায়, প্রৌঢ় বয়সে। একে অন্যকে চিনে নেয় ঠিক! খানিক চেনা দেওয়া, খানিক না দেওয়ার আবহ জুড়ে বেজে চলে-

"রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।..."

সবশেষে মানসী ট্রেন থেকে নেমে যায় তার সঙ্গীসাথীর সঙ্গে। একা সেই কামরায় থেকে যায় অমিত। আবহে বেজে ওঠে,

"সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে
আমি চললেম একা"

এই সিনেমা জুড়ে থাকে একটাই কবিতা, 'হঠাৎ দেখা'।

কেদারা (২০১৯):

ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'কেদারা' সিনেমাটি নরসিংহ (অভিনয়ে-কৌশিক গাঙ্গুলি) নামক এক নিঃসঙ্গ, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ একা মানুষের কাহিনি। তাঁর অন্যতম নেশা ভেন্ট্রলোকুইজম। পিতৃপুরুষের ভিটেয় একটা অন্ধকার নিরালায় নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করেন নরসিংহ। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে এই সিনেমায় আবহ নির্মাণ করেছে শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পাখিরা বুঝি মাইনে পায়" কবিতা-

"পাখিরা বুঝি মাইনে পায়?
মেঘেরা বুঝি অফিস যায় রোজ?
হাওয়ার বুঝি ব্যবসা আছে কোনো?
নদীরা বুঝি চুক্তি হলে, তবেই করে সমুদ্রের খোঁজ?..."

নরসিংহের মতন এমন একাকিত্বে মোড়ানো অসহায় মানুষ পাখির মতন, কেবল খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচতে ভালোবাসে! তারা অন্য সাধারণ মানুষদের চাকুরে জীবনে অভ্যস্থ হতে পারে না। লিখিত চুক্তি ছাড়াও তারা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন 'স্ত্রী'কে বারবার ফোন করে চেয়ে নেয় ঋর্ণার খোঁজ। মেঘ, সমুদ্র কিংবা একাকী নদীর যে ডাক, সেই হাতছানি দেওয়া আহ্বান শোনার ক্ষমতা থাকে কেবল এই নিঃসঙ্গ হৃদয়গুলোর!

গবেষণার ফলাফল:

অতএব, বিভিন্ন বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার পর্যালোচনা করে কী বোঝা গেল? বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার কেবল নান্দনিক অলংকার হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা প্রায়ই চরিত্রের অন্তর্লৌকিক মানসিক অবস্থার এক প্রকার ভাষ্য হয়ে ওঠে। অনেক সময় চলচ্চিত্রে এমন কিছু আবেগ, সংকট বা স্মৃতি জুড়ে থাকে, যা সরাসরি সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায় কবিতার পঙ্‌ক্তি চরিত্রের মনের অপ্রকাশিত অংশকে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। গবেষণার দৃষ্টিতে দেখা যায় যে একুশ শতকের শুরুতে নির্মিত বহু বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার এই ব্যবহার একটি সচেতন ন্যারেটিভ কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে স্মৃতি ও নস্টালজিয়ার নির্মাণে কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। অনেক চলচ্চিত্রে অতীত স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ প্রেমের প্রসঙ্গে কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতার ভাষা সাধারণত ইঙ্গিতপূর্ণ ও প্রতীকসমৃদ্ধ হওয়ায় তা স্মৃতির আবছায়া অনুভূতিকে খুব স্বাভাবিকভাবে ধারণ করতে পারে। ফলে যখন কোনো চরিত্র অতীতের দিকে ফিরে তাকায়, তখন একটি কবিতা সেই স্মৃতির আবহকে নির্মাণ করে, যে আবহের গভীরতা সাধারণ আলাপচারিতায় বা কথোপকথনে এভাবে ধরা যেত না। চলচ্চিত্রের দৃশ্যভাষা ও কবিতার প্রতীকী ভাষার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় যেমন উপমা, রূপক বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে অনুভূতির প্রকাশ ঘটে, তেমনি চলচ্চিত্রেও দৃশ্য, আলো, শব্দ এবং সম্পাদনার মাধ্যমে অর্থ নির্মিত হয়। ফলে কবিতা যখন চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন দুটি শিল্পভাষা একে অপরকে যারপরনাই সমৃদ্ধ করে। এই সমন্বয়ের ফলে দৃশ্যের অর্থ কেবল দৃশ্যমানতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা শব্দের নন্দনতত্ত্বের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়ে ওঠে।

নারী চরিত্রের অন্তর্জগৎ প্রকাশের ক্ষেত্রেও কবিতার ব্যবহার বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। অনেক চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের নীরব যন্ত্রণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা বা একাকিত্বকে প্রকাশ করার জন্য কবিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কারণ কবিতা আবেগের সূক্ষ্ম স্তরকে প্রকাশ করতে সক্ষম। ফলে নারী চরিত্রের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম বা মানসিক টানাপোড়েন দর্শকের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্র ও কবিতার অনেকসময় একটি আন্তঃপাঠিক (intertextual) সম্পর্কও তৈরি হয়। এর ফলে চলচ্চিত্রের অর্থের পরিধি বৃদ্ধি পায়। দর্শক একইসঙ্গে সাহিত্যিক স্মৃতি এবং দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটিয়ে নতুন অর্থ অনুধাবন করতে পারে।

বাংলা সমাজে কবিতা পাঠ এবং কবিতার প্রতি আবেগ দীর্ঘকাল ধরে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে বিদ্যমান। যখন চলচ্চিত্রে পরিচিত কবিদের রচনা ব্যবহৃত হয়, তখন তা কেবল একটি দৃশ্যের আবহ তৈরি করে না; বরং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক স্মৃতির সঙ্গেও দর্শককে যুক্ত করে। এর ফলে চলচ্চিত্রটি একটি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে কাজ করে। বেশ কিছু চলচ্চিত্র কবিতার বয়ানেই নির্মিত।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চরিত্র নির্মাণে কবিতার ভূমিকা। কোনো চরিত্র যখন একটি নির্দিষ্ট কবিতা পাঠ করে বা তার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক দেখা যায়, তখন সেই চরিত্রের মানসিক গঠন সম্পর্কে দর্শক একটি

ধারণা পায়। এর মাধ্যমে চরিত্রের সংবেদনশীলতা, চিন্তার ধারা কিংবা আবেগপ্রবণতা সহজেই প্রকাশিত হয়। ফলে কবিতা চরিত্রের অন্তর্লৌকিক জগৎ নির্মাণের একটি কার্যকর উপায় হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের বয়ানে কবিতা যুক্ত হওয়ার ফলে গল্প বলার কাঠামোতেও এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্রে যেখানে ঘটনাপ্রবাহই মূল চালিকাশক্তি, সেখানে কবিতাময় চলচ্চিত্রে আবেগ ও পরিবেশ অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। এই ধরনের চলচ্চিত্রে ঘটনাগুলোর মধ্যবর্তী নীরবতা, দৃশ্যান্তর বা চরিত্রের একাকিত্বের মুহূর্তগুলো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কবিতা এই মুহূর্তগুলিকে আরও অনেকখানি অর্থবহ করে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, একুশ শতকের বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি চলচ্চিত্রের আবেগীয় গভীরতা বৃদ্ধি করে, চরিত্রের মানসিক জটিলতাকে উন্মোচিত করে এবং সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে এক সৃজনশীল সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। এই প্রবণতা বাংলা চলচ্চিত্রকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যত গবেষণার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

উপসংহার:

সকল বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার হবে, এমন আশা করা অবশ্য ঠিক নয়। খুব কম চলচ্চিত্রে আবহ নির্মাণ করতে পারে কবিতা কিংবা কোনো চরিত্র পাঠ করে কোনো কবিতা। সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্য, চরিত্রসৃষ্টি, উপস্থাপনা, টার্গেট অডিয়েন্স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে সেখানে কবিতার ব্যবহার কতটা যথপোযুক্ত হবে। কিন্তু, এটুকু বলাই যায় যে বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতাকেন্দ্রিক বা কবিতাকে সঙ্গী করে কাজ হয়েছে তুলনায় অনেক কম। অথচ, যেসব কাজ হয়েছে এতকাল, সেই দৃষ্টান্তদের দিকে ফিরে তাকালে বোঝা যায় যে সেখানে গানের ব্যবহার না থেকেও তার পরিবর্তে কবিতা কতখানি শ্রুতিমধুর হয়ে উঠছে। বহু ঐশ্বর্য ধুলোচাপা পড়ে থাকে কবেকার কোন ফেলে আসা কাব্যগ্রন্থে, বাড়ির পুরোনো ভাঙা আলমারিটায়...কখনও বা থাকেও না! সেসব শব্দকে যদি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপহার দেওয়া হয়, তাহলে দৃশ্য, শব্দ ও মুহূর্তরা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগিয়ে তুলবে প্রাণস্পন্দন, প্রশান্তি, তৃপ্তিবোধ ও সম্মোহন!

তথ্যসূত্র:

ব্যবহৃত কবিতার উৎস-

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, পৌষ, ১৩৩৮, পৃ. ৩৬।
২। তদেব, পৃ. ২৩৮।
৩। তদেব, পৃ. ৩৬০।
৪। তদেব, পৃ. ৪১৮।
৫। তদেব, পৃ. ৪৮৭।
৬। তদেব, পৃ. ৫৭২।
৭। তদেব, পৃ. ৭১৯।
৮। তদেব, পৃ. ৮১৭।
৯। দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। "দূরের পাল্লা।" https://www.bangla-kobita.com/satyendranath/durer-palla/
১০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুজাতা। "আত্মজ।"

http://amarpriyokobitarkhata.blogspot.com/2015/02/blog-post_12.html। প্রবেশের তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

১১। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। আসলে কেউ বড় হয় না। https://bengaliforum.com/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%89-%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-a/ , Bengali Forum।

১২। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না। https://www.kobitacocktail.com/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-sunil-gangopadhyay/ । প্রবেশের তারিখঃ ১৪ মার্চ ২০২৩।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। পদ্যসমগ্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃ. ৯৭।

১৪। তদেব, পৃ. ১২৫।

১৫। আজাদ, হুমায়ুন। শুভেচ্ছা। http://kobitarakash.blogspot.com/2014/06/blog-post_19.html।

১৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুজাতা। চুম্বন। https://sahityabhalobese.blogspot.com/2017/07/blog-post_62.html। প্রবেশের তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০১৭।

১৭। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ৫১।

১৮। তদেব, পৃ. ১৩৯।

১৯। তদেব, পৃ. ১৬১।

২০। তদেব, পৃ. ২৩৭।

২১। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ. ১৮৫।

২২। তদেব, পৃ. ১৯৪।

২৩। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। প্রভু নষ্ট হয়ে যাই। https://www.bangla-kobita.com/shaktichattopadhyay/probhu-noshto-hoye-jai/

২৪। গোস্বামী, জয়। নন্দর মা। https://www.musixmatch.com/es/letras/Shafi-s/Nondor-Ma-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE। প্রবেশের সালঃ ২০২২।

২৫। গোস্বামী, জয়। কাজরীর জ্বর। https://abahaman.wordpress.com/2014/05/02/%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE/। প্রবেশের তারিখঃ ২ মে ২০১৪।

২৬। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ২৭০।

২৭। তদেব, পৃ. ১৩৮।

২৮। তদেব, পৃ. ১৪৫।

২৯। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ৩৭।

৩০। চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র। মানুষ। https://www.kobikolpolota.in/manush-kobita-birendra-chattopadhyay/।

৩১। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়। https://www.kobitacocktail.com/%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC/।

৩২। দাশ, জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, ১৯৫৪, পৃ. ৯১।

৩৩। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৩, পৃ. ৪১।

৩৪। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। স্মৃতির শহর ০১। https://www.poetrystate.com/sunil-gangopadhyay/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%b9%e0%a6%b0-%e0%a7%a6%e0%a7%a7-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ae/। প্রবেশের সালঃ ২০১৯।

৩৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শেষের কবিতা। আদ্রিশ পাবলিকেশন, ১৪২১, পৃ. ৯৪।

৩৬। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। সোমলতাকে। https://www.kobikolpolota.in/somlotake-kafer-tomake-valobaslam-bole-kobita/।

৩৭। ঘোষ, শঙ্খ। সঙ্গিনী। https://www.kobitacocktail.com/%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7/। প্রবেশের তারিখঃ ১১ জুন ২০২৪।

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজাত। "পাখিরা বুঝি মাইনে পায়।" https://www.amarkobita4u.com/2020/12/pakhira-bujhi-maine-pay-lyrics-srijato.html।

৩৯। বসু, সুদেষ্ণা। তিনি ছিলেন ভারতীয় সিনেমার আচার্য, এক বৈষ্ণব চলচ্চিত্রকার। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, https://www.anandabazar.com/patrika/a-special-article-about-film-director-debaki-kumae-bose-1.975996, প্রবেশের তারিখঃ ৬ এপ্রিল ২০১৯।